"অতিমারীর আবহে মায়ের আবাহন"

হাতে খড়ি

দ্বিতীয় সংখ্যা • শারদ সংখ্যা ১৪২৮

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন : বাংলা বিভাগ

. . . • হাতে খড়ি • . . .

দ্বিতীয় সংখ্যা • শারদ সংখ্যা ১৪২৮

প্রকাশ : ৯ নভেম্বর, ২০২১ (চতুর্থী)

• সম্পাদক •

প্রীতিষা মাইতি

(পঞ্চম সেমিস্টার)

• সহসম্পাদকমন্ডলী •

মন্দিরা বসাক, নন্দিনী বোস, আলিশা নাসরিন, বৈশাখী গাইন, মেঘা বসাক

(তৃতীয় সেমিস্টার)

• প্রচ্ছদ নির্মাণে •

টিনা মাজী

(পঞ্চম সেমিস্টার)

• অলঙ্করণে •

প্রীতিষা মাইতি

(পঞ্চম সেমিস্টার)

সম্পাদকীয়

সম্পাদিকার কলমে ,

“ জাগো, তুমি জাগো

জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিনী...”

দশপ্রহরণধারিনী মা বিশ্বমানবের জীবন থেকে করোনাসুরকে বধ করবেন, এই আশা নিয়ে ১৪২৮ এর আশ্বিনে প্রকাশিত হলো আমাদের বাংলা বিভাগের ‘হাতে খড়ি’ ই – পত্রিকার দ্বিতীয় সংস্করণ ও ‘শারদ সংখ্যা’। এই সংখ্যার প্রাপ্তি, আমাদের এই পথচলায় সঙ্গ নিয়েছে ‘বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন’ এর অন্যান্য বিভাগের ছাত্রীরাও। তাই এবারে আমরা আরও বেশি উৎসাহিত ও আনন্দিত। এমন এক গৃহবন্দী দশার মাঝেও শিল্প ও সাহিত্য চর্চা এভাবেই বেড়ে চলুক সকল নবীনা সাহিত্যিক ও শিল্পীদের হাত ধরে।

গতানুগতিক পড়াশোনার বাইরে নিজের শিল্পিসত্তাকে, মননশীল ভাবনাগুলোকে নিজেদের মতো করে এই পত্রিকার পাতায় বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে আমাদের সহপাঠীরা, দিদিরা ও বোনেরা। গতবারের ভুলগুলিকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করেছি এই সংখ্যায়। তবুও ‘হাতে খড়ি’র আঁকাবাঁকা হরফের মত কিছু ভুল ত্রুটি হয়তো রয়েই গেলো। পরবর্তী সংখ্যায় পত্রিকাকে আরো পরিণত করার অঙ্গীকার নিলাম।

‘হাতে খড়ি’র দ্বিতীয়সংখ্যার থীম—“অতিমারী আবহে মায়ের আবাহন”। করোনাসুরের আক্রমণে রোগ-দৈন্য-হতাশায় ছেয়ে গেছে সারাবিশ্ব, থমকে গেছে জীবনের চলমানতা - কঠিন এই পরিস্থিতিতে আমরা সকলে আমাদের প্রাণের প্রিয় উমা মা কে আবাহন করেছি মনের একান্ত আশা নিয়ে যে, এই পৃথিবী খুব শিগগিরই রোগমুক্ত হবে। আবার স্বাভাবিক জীবনে আনন্দিত হয়ে উঠবে ধরিত্রী।

সবশেষে এই 'শারদ সংখ্যা' প্রকাশ এর পথে সম্মাননীয়া অধ্যক্ষা মহাশয়া ও আমার বিভাগীয় সকল অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা, যাঁদের উৎসাহ প্রাণিত করেছে আমাদের। পত্রিকার সহ - সম্পাদকমন্ডলীকে, পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের লক্ষ্যে সমবেত হয়ে কাজ করার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আর অবশ্যই আমার সহপাঠীদের, দিদিদের এবং কনিষ্ঠাদেরকেও ভালোবাসা ও ধন্যবাদ জানাই তাদের অমূল্য কাজগুলি দিয়ে আমাদের পত্রিকার পথচলাকে মসৃণ রাখার জন্য। সবশেষে, পত্রিকার পাঠকবৃন্দকেও জানাই ধন্যবাদ। কারণ, পাঠকের উৎসাহ ব্যতীত পত্রিকা মূল্যহীন।

সকলে পাশে থাকবেন, সাথে থাকবেন।

— ধন্যবাদান্তে

সম্পাদক (হাতেখড়ি)

প্রীতিষা মাইতি

বাংলা বিভাগ (পঞ্চম সেমিস্টার)

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

“ অতিমারী আবহে মায়ের আবাহন ”

• সূচিপত্র •

কবিতা

১. প্রার্থনা — টিনা মাজী ৯ .
২. ক্লান্ত পথিক — সুপ্রীতি দেব ১০ .

অনুকবিতা

১. শিউলি — পিয়ালী দাস ১২ .

অণুগল্প

১. আগমনী — পিয়ালী দাস ১৪ .
২. মন খারাপ — প্রীতিষা মাইতি ১৬ .
৩. ক্ষুদে সৃষ্টি — পৌষালী চক্রবর্তী ১৮ .
৪. দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন — প্রীতি প্রামাণিক ২০ .
৫. জাগরণ — পিয়ালী দাস ২২ .
৬. জীবনের গল্পকথায় মা — তৃষা চক্রবর্তী ২৪ .
৭. শিক্ষা আনে মুক্তি — প্রীতিষা মাইতি ২৫ .
৮. কুসংস্কারবিনাশিনী উমা — প্রীতি প্রামাণিক ২৭ .

ছোটগল্প

১. অতিমারীর আবহে মায়ের আবাহন — দীপাঞ্জনা দাস ২৯ .
২. মৃন্ময়ী — তিথি শীল ৩২ .
৩. রামনাথবাবুর আশ্চর্য দোকান — মন্দিরা বসাক ৩৫ .
৪. রমেশবাবুর রহস্যভেদ — সায়ন্তিকা দাস ৩৯ .
৫. মহিষাসুরমর্দিনী — মন্দিরা বসাক ৪৩ .

খোলা চিঠি

১. মন্দিরা বসাক ৪৬ .
২. প্রীতিষা মাইতি ৪৮ .

আঁকিবুঁকি

১. বৈশাখী গাইন ৫১ .

২. রূপসা চ্যাটার্জী ৫২ .

৩. ইন্সিকা ঘোষ ৫৩ .

ফটোগ্রাফি

১. অঙ্কিতা রায় ১৯ .

২. দেবিকা সাহা ৫৫ .

৩. প্রীতিষা মাইতি ৫৬ .

৪. সুলগ্না দে ৫৭ .

৫. তৃষা চক্রবর্তী ৫৮ .

৬. ঈশা মন্ডল ৫৯ .

৭. সায়ন্তিকা দাস ৬০ .

“কবিতা”

প্রার্থনা

সেই যে গেল ২০১৯
তখন সবাই ভালোই ছিলাম!
ছিল না বাধা ছিল না ভয়
রাস্তাঘাটে সব সময় নির্ভয়
যাতায়াত করাই যায়।
সেই বছর আনন্দে জমিয়ে
দুর্গাপুজো দেখলাম বেশ।
কিন্তু ২০১৯কি তবে
নির্ভয় পুজো দেখা শেষ?
তারপর এল ২০২০
সাথে নতুন ভাইরাসের ঝুলি;
শুরু তার তাণ্ডব খেলা
তার সাথে প্রিয়জনের মৃত্যু মেলা।
এই বছর ২০২১ একভাবে শুরু হলো
তবু শরৎমেঘ দেখায় নতুন আলো।
পঞ্জিকা মতে মায়ের আগমন ঘোড়ায়
এবং গমন দোলায়;
শাস্ত্র মতে এইবারও কি ফল তবে শুভ
নয়?
কিন্তু তুমি তো সকলের মা
তাই তোমার কাছে একটি প্রার্থনা।
সুস্থ করো পৃথিবীকে তুমি
সকল রোগ ভাইরাস তাড়িয়ে;
সুস্থ হব তবেই মোরা
সকল রোগ সারিয়ে।।

টিনা মাজী
পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

ক্লান্ত পথিক

বৃষ্টি ভেজা- সন্ধিক্ষনে
ঘর নেই যার একখানি,
মধ্য পথে খুঁটি বেঁধে
কেমনে চলবে তার দিনখানি।
ঝড়ঝঞ্জার মাঝখানে সে
বিপদগ্রস্ত - অসহায়,
সাহায্য করার নেই যে কেউ
অবহেলায় সে কষ্ট পায়।
পরিশ্রান্ত ক্লান্ত শরীরে বানায় সে
এক নিরাপদ স্থান,
দিন শেষে তা গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়
ট্রাক্টর লরি আর মোটর যান।
আঁধার নামে- সন্ধ্যাবেলা
চিন্তায় সে ভরাডুবি,
নেই কো ছাদ যার নেই কেউ
কে ধরবে তার হাতখানি।
অবশেষে রাস্তা মেলে
দুঃখ ঘোচে- সাময়িকক্ষনে,
রাত কেটে যায় অপেক্ষাতে
দিন শুরু হয় কায়িক শ্রমে।
এক ঘেয়ে পরিশ্রমে
ক্লান্ত পথিক ভেঙে পড়ে,
ক্ষুধার জ্বালায় ছটফটিয়ে
পড়ে থাকে সে পথের ধারে।।

সুপ্রীতি দেব
তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
ভূগোল বিভাগ

“অনুকবিতা”

শিউলি

সময় হয়েছে এবার ওদের ফেরার,
শিউলি হয়ে মাটির কোলে ঝরে পরার।
সেদিন ছিলো ও"রাও গাছের মাঝে-
পাতার ভাঁজে ফুলে ফুলে ভরে;
সময় এসেছে এবার ওদের ফেরার,
শেষ বেলাতে মাটির কোলে ঝরে পরার।

পিয়ালী দাস
তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

“অনুগল্প”

আগমনী

আশ্বিনের মাঝামাঝি
উঠিল বাজনা বাজি।
পূজোর সময় এলো কাছে,
মা আসছেন তার বাপের বাড়ি।
আসছেন শরৎ - এর আকাশে বয়ে চলা
পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ভেলায় চেপে।
কাশ বনের পাশ দিয়ে ছুঁটে চলা
ট্রেন দেখতে আসা
কৌতুহলী অপু, দূর্গার হাত ধরে।

ক্লাব গুলি সেজে উঠেছে নানান রঙের বাহারে, সেজে উঠেছে আমার তিলোত্তমাও। আবার একটা বছর পর উমা আসছে যে। আমার চেনা শহর রঙের মঞ্চনায়। অচেনা হয়ে উঠবে আবার একটা বছর। আগমনীর বার্তা আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দেবে উড়ন্ত নীলকণ্ঠ পাখি।

কুমোরটুলি বটুয়াপাড়ায় আজ উমা আসার আনন্দ। কুমোরটুলি গুলোতে উমা সেজে উঠছে অভিনব সাজে। মানুষ একে অপরের বিভেদ ভুলে আরও একবার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবে। এত আনন্দের মাঝেও কুমোরটুলির নিখিলের চোখে ঘুম নেই। নিখিল আটত্রিশ বছর একজন প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক। বর্তমান পত্রিকা থেকে একটুকরো কাজের খোঁজে কলকাতায় আসে সে। বাড়িতে ফেলে এসেছে দুর্বলচিত্ত

বাবা-মা, বউয়ের আঁখি আর তার একমাত্র মেয়ে উমাকে। কুমোরটুলির মাইনেও বেশি নয়। মালিক পক্ষকে বলেও তেমন কোন লাভ হয় না তার। খরে উমার গায়ে মাটি দেওয়ার সময় তার চোখে প্রায়ই ভেসে ওঠে মেয়ে উমার ফুটফুটে মুখখানি। আজ চার বছর হয়ে গেল সে তার মেয়েকে দেখে নি।

"মেয়ে নিশ্চই কথা বলতে শিখেছে? একটু একটু হাঁটতেও পারে বোধ হয়"!

বাবার শরীর কেমন আছে , মায়ের পায়ের ব্যাথাটা বাড়লো নাতো! আর রাখি, রাখি ভালো আছে তো? ওর তো আবার অল্প অল্প বুকে ব্যাথা। এইসব কথা চিন্তা করে অনিদ্রায় চোখের তলায় কালি পড়ে যায় তার। কুমোরটুলির কাজ শেষ হলে একটু বাড়তি আয়ের খোঁজে নিখিল ঘুরে বেড়ায় কলকাতার অলিতে গলিতে। কারোর গাড়ি ঠেলে দেওয়া, কারোর গাড়িতে মাল তুলে দেওয়া , যেকোনো কাজই হোক না কেন সব কাজই সে করে। কখনো টাকা পায় আবার কখনও পায় না। এভাবেই চলে যায় দিনের পর দিন। কিন্তু নিখিলের মনে হয় সময় যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। দিন বদলে গেলেও সময় যেন বদলাতে চায় না। সময়ের অতুল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েও বেদনা ভুলে নিখিলেরা আরও একবার মেতে উঠবে উমা গড়ার আনন্দে। 'কারণ বছর ঘুরে যে আবার আসছে মা'।

পিয়ালী দাস
তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

মন খারাপ

"আশ্বিনের শারদ প্রাতে
বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর..."

আর আশ্বিন!! আজ মহালয়া। এক সপ্তাহ পর পুজো। আর এদিকে দু দিন ধরে মুসলধারে বৃষ্টি। বিগত দু দিন ধরে যেমন সূর্যের দেখা নেই, তেমনি দেখা নেই শুভ্রার মুখে হাসির। রাস্তায় এক হাঁটু জল জমে। ওদের বাড়ি থেকে একটু দূরেই পাড়ার প্যান্ডেলটা দেখা যাচ্ছে। প্রায় হয়েই এসেছে কিন্তু এখন প্লাস্টিকে চাপা দেওয়া। পাড়ায় ঢোকার মুখে বাঁশ দিয়ে বানানো এন্ট্রান্সটার কাজও শেষ হয়নি এখনও। লাইটিং এর কাজ যদিও শেষ। রাস্তার দুপাশ ধরে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ব্যানারগুলো দেখলেই মনে একটা পুজো পুজো ভাব জাগে। মনে হয় এবার পুজো চলে এসেছে। শৃঙ্গার অ্যাপার্টমেন্ট এর চারতলার খোপ থেকে এসব কিছু দেখতে দেখতে শুভ্রার মনটা আরো খারাপ হয়ে আসে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ও। কত কিছু প্ল্যান করে আছে সেই গত মাস থেকে। পঞ্চমী টু নবমী পুরো প্যাকড আপ! কিন্তু এমন বৃষ্টি চলতেই থাকলে নতুন জামাগুলো পড়বে কি করে! সারা রাস্তা কাদা আর প্যাচপ্যাচে। রাস্তায় বেরোলে নতুন জুতোটার কি দশা হবে কি জানি! আচ্ছা এক হাতে ছাতা থাকলে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ছবি তুলবে কি করে! ভালো লাগে এভাবে পুজো কাটাতে! "ধুর" বলে জানলাটা জোরে বন্ধ করে দেয় শুভ্রা।

ওর মতোই রাস্তার ধারে থাকা ছোট্ট ফুলিরও আজ মন খারাপ। শুধু কারণটা আলাদা। তিরপলের আড়ালে বাঁশের খুঁটি টা ধরে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে ও ভাবছে, এমনভাবে বৃষ্টি চলতে থাকলে পুজোর দিনগুলোতেও যদি রাস্তায় জল থাকে, বাটি হাতে ও কোথায় বসবে! এই পুজোতেই তো একটু বেশি রোজগার হয় ওদের। গত বার তো তেমন কিছুই লাভ হয়নি। এবার হবে তো?

প্রীতিষা মাইতি

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

ক্ষুদে সৃষ্টি

গতকাল বাগবাজার-এর একটা ছোট্ট গলি হয়ে হেঁটে আসছি, হঠাৎ রাস্তার ধারে চোখ যাওয়াতে দেখলাম কতগুলো ক্ষুদে শিল্পী, বসে ঠাকুর বানাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন পরিচালক আর বাকি শিল্পীরা তার পরিচালনায় কাজ করছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাদের কাজকর্ম দেখায় তাদের মধ্যে একজন একরাশ মিষ্টি একটা হাসি নিয়ে বললো "দিদি, আমরা এরম প্রত্যেক বছর বানাই"

ওদের নিখুঁত কাজ দেখে মনে হচ্ছিলো ওরা বোধহয় 'পাল' দেরই ছেলেমেয়ে। জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলাম, তারা কেউই জন্মগতভাবে এই প্রতিভা নিয়ে আসেনি।

মাটির তাল দিয়ে ঠাকুর না হয় বানানো গেলো প্রশ্ন এবার পুজো কি করে হবে আবার 'দুর্গাপুজো' বলে কথা। জিজ্ঞেস করলাম "পুজো কিভাবে করবি তোরা?" বললো "ও, আমরাই সব করি, আমাদের ওসব ব্রাহ্মণ লাগে না" ...

অনুপম রায় বলেছেন, "তুমিও হেঁটে দেখো কলকাতা"

গোটা কলকাতা কিনা বলতে পারবো না, তবে উত্তর কলকাতা-র অলিগলিতে পাওয়া যায় 'creativity' থুরি 'শিল্পত্ব'।

ও, আর একটা কথা

পুজোর গন্ধ বোধহয়, হাত থেকে স্মার্টফোনও সরিয়ে দিতে জানে, তাই না?!

পৌষালী চক্রবর্তী
ষষ্ঠ সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)
ইংরেজী বিভাগ

অঙ্কিতা রায়
ষষ্ঠ সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন

"আশ্বিনের শারদ প্রাতে
বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর
ধরনীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা
প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত
জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা।"

—"উফফ্! গিন্নি কি শুরু করলে বলতো সকাল সকাল কানের কাছে জোরে রেডিও চালিয়ে দিয়ে।" আরে মশাই আজ যে মহালয়া আপনি কি ভুলে গেলেন! আর মহালয়ার দিন সকালবেলা ঠিক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায় মহালয়াটা না শুনলে মন ভরে না। আজ থেকে তো উমা মায়ের আগমন ঘটে গেল।

"আরে আমি তো ভুলেই গেছিলাম! আজ আমার আর এক উমা দীর্ঘ দশ বছর পর নিজ ঘরে ফিরে আসছে। আজ আমাদের বড়ো খুশির দিন। গিন্নি আজ ভালো করে রান্না কোরো তো। আমি বাজারে গেলাম গলদা চিংড়ি , ইলিশ মাছ আর খাসির মাংস আনতে। বেশ করে গলদা চিংড়ির মালাইকারি , ইলিশ মাছের ভাঁপা , খাসির মাংসের ঝোল খাওয়া হবে। এগুলো যে মেয়েটার খুব প্রিয় খাবার।"... একদিকে যেমন এরকম খুশির আমেজ লেগে আছে অন্যদিকে তেমনই বেজে উঠেছে বিচ্ছেদের সুর। ওই কথাতেই আছে না যে দুঃখ না থাকলে সুখ অনুভব করা যায় না ঠিক তেমনটাই ঘটে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে। ঠিক এই সময় রায়বাবু বাজারে যাওয়ার সময় দেখলেন এক বৃদ্ধা মহিলা ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া মা দূর্গার দিকে অশ্রু নয়নে তাকিয়ে আছেন। কেন জানেন! আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগে তারও প্রানের প্রিয় নাতনি কুহুকেও নিজের প্রাণের বলি দিতে হয়েছিল চার জন মানুষরূপী

নরপিশাচের হাতে। কি দোষ ছিল বলতে পারেন ওই নয় বছরের স্কুল থেকে ফেরা বাচ্চা শিশুটির? সত্যিই আমাদের সমাজটা বড়োই অদ্ভুত। একদিকে যেমন দীর্ঘ দশ বছর পর ঘরের দূর্গা ঘরে ফিরে আসছে, ঠিক তেমনি অন্যদিকে আরেক উমা প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। করোনা নামক ব্যাধিতো পৃথিবীকে ধ্বংস করতেই বসেছে! আর তার সাথে সাথে মানুষই মানুষকে হত্যা করে চলেছে।

প্রীতি প্রামাণিক

ষষ্ঠ সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

জাগরণ

পূজো আসতে আর কয়েকটা দিন বাকি। ঝন্টু ছোট্ট ছোট্ট লাইটগুলো একত্রিত করে মা দূর্গার মুখ মন্ডলের আদল দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু হঠাৎ তার কাজ থেমে যায়। একি! এইটা তো সে তার মেয়ের মুখ মন্ডলের আকৃতি করে ফেলল। মন্ডপের আলোক সজ্জার কাজ করতে গ্রাম থেকে এসেছে ঝন্টু। ভয়ঙ্কর মহামারী জয় করে মা ফিরছে বঙ্গে। ঝন্টুর গ্রামে প্রতি বছর দূর্গা পূজো হলেও এবারে আর হবে না। আর হবেই বা কি করে গ্রামে ভূমি বলে আর কিছু নেই সব জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে ইয়াসে।

"কি রে তোকে না বললাম দেবী দুর্গার মুখমন্ডলের আদলের লাইটিং বানাতে। তুই এইটা কি বানালি!" চিৎকার করে ওঠে ক্লাবের সভাপতি। লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। সকলের কাছে ক্ষমা চায় ঝন্টু। উমা ফিরছে ঘরে। আর তার উমা চলে গেছে পরলোকে। করোনা হয়েছিল মেয়েটার। সে আর তার স্ত্রী বেঁচে গেলেও উমা বাঁচে নি। অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে আলোক সজ্জায়। তবে একটা আনন্দ! ঝন্টু তার আলোকসজ্জায় ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা আর দূঃখী মানুষের মুখে ফুটিয়ে তুলবে হাসি। তাতেই তার জয়! আকাশ বাতাস পুজোর গন্ধে ভরে গেছে দেবীর আগমনী বার্তা জাগরিত হয়েছে যে।

ঝন্টু মনোযোগ সহকারে গড়তে থাকল লাইটিংটা। এবার কে বলেরে, এইটা দেবী দুর্গার মুখমন্ডল নয়। তার মেয়ের মুখমন্ডলের উপর মুখে তার মেয়ে।

ক্লাবের সভাপতি তদারকি করতে আর একবার এগিয়ে এলেন। পিঠে চাপড়

মেরে ঝন্টুকে বললেন- 'বাহ্, দারুন! দেবীর মুখটা তো তুমি দারুন ফুটিয়ে তুলেছ'। মৃদু হাসে ঝন্টু। এই মহামারীকে সে চোখ তুলে দেখিয়ে দেবে তার ছোট মেয়েকে সেই অসুর জীবন থেকে কেড়ে নিলেও মন থেকে কেড়ে নিতে পারেনি। তার পাশাপাশি ঝন্টু কয়েকটা সচেনতামূলক লাইটিং বানাবে যাতে দেবী দূর্গার এই আবাহনে অতিমারীর অসুর সক্রিয় না হয়ে ওঠে।

পিয়ালী দাস

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

জীবনের গল্পকথায় মা

টিয়া আজ অনেকদিন পর বাবার সাথে বেরিয়ে অনেক কিছু কিনল। যথারীতি টিয়ার খুবই আনন্দ হওয়ার কথা কিন্তু তা না হয়ে সে কিছু একটা যেনো খুঁজছিল। রঞ্জন (টিয়ার বাবা) মেয়ের এরকম আচরন দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে মা।" টিয়া বলে, "আচ্ছা বাবা আমরা তো প্রতি বছর পুজোয় নতুন জামা আরো কত কি কিনি। এবার তুমি আমার ওই সব কিছু ওদের দিয়ে দেবে?" রঞ্জন মেয়ের এই কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর হাঁটতে শুরু করলেন মেয়ের হাত ধরে, থামলেন এক ফুটপাতে এসে যেখানে টিয়ার বয়েসী অনেক ছেলে মেয়ে রয়েছে কিন্তু তাদের দিকে তাকানোর মতো কেউ নেই। রঞ্জন তার মেয়ের দিকে নতুন জামার প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এই বছর আমার ঘরের ছোটো মা দুর্গার হাত দিয়েই না হয় ওদের পুজো টা শুরু হোক।" এই বলে রঞ্জনের দু চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এল।।

তৃষা চক্রবর্তী
তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

শিক্ষা আনে মুক্তি

কুলীন ব্রাহ্মণ নবীনবাবুর তিনটে বউ ও একটি ছেলে থাকা সত্ত্বেও একটি সুন্দর, সুশ্রী অল্পবয়স্কা মেয়েকে বিয়ে করে আনে। সকলে একসাথে সুখেই দিন যাপন করত। একদিন কাজের মাঝে হঠাৎ নতুন বউ সুমিত্রার চোখ পড়ে মেজ বউ কুসুমের পেটের দিকে। পেটের ঠিক নীচটায় সেলাই করা। একটু উঁচুও হয়ে আছে। শুকিয়ে যাওয়া রক্ত দেখে সদ্যই মনে হচ্ছিল সেলাইটা। কুসুমের কাছে ওর এই অবস্থার কারণ সুমিত্রা অনেকবার জিজ্ঞেস করলেও উত্তর পায়নি।

হঠাৎ একদিন প্রায় পাঁচ ছ মাস পর রাতের বেলা ঘুম ভাঙতেই সুমিত্রা চোখ খুলতেই দেখে একটা বন্ধ করে আগুনের সামনে শুয়ে আছে ও। সামনে নবীন ও একটি ভন্ড সাধু বসে। ও উঠতে যাবে এমনসময় নবীন একটা ছুরি নিয়ে এগিয়ে আসে ওর দিকে, আর ছুরিটা চালিয়ে দেয় পেটের ঠিক নীচটায়। একটা বীজের মতো জিনিস ওর ওই কাটা অংশের ভেতর ঢোকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কষ্টে যন্ত্রণায় ছটফট করে সুমিত্রা, শরীরে বল নেই। কিন্তু ওর মনে বল আছে, ওর মস্তিষ্কে বল আছে। দুজনকে ধাক্কা দিয়ে পেটে হাত দিয়ে বেরিয়ে আসে ঘরের বাইরে।

বেরিয়ে দেখে কুসুম দাঁড়িয়ে!! ও জানে সব! কুসুম বলে, "একি সুমি! ও ঘর থেকে বেরিয়েছু কেন! তোর পেটে সেলাই করেনি! বীজ দেয়নি!" সুমিত্রা হতবাক হয়ে কুসুমকে প্রশ্ন করে "মানে! তুমি জানো?" কুসুম দু হাত দিয়ে সুমিত্রার বাহুদুটো ধরে বলে, "ওরে, ওটা মন্ত্র পুড়া বীজ। ওতে তোর পেটে ছেলে জন্মাবে রে! এই যে দেখ আমার পেটেও আছে।তবে একটা নয়, দু দুটো!!" এই বলে নিজের ওই সেলাই করা জায়গাটায় হাত বুলিয়ে যেন মাতৃত্বের সুখ অনুভব করে। সুমিত্রা আর কোনো

কথা না বলে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। বাড়ি থেকে অনেক দূরে হাফ ছাড়তেই ওর মনে পড়ে বিদ্যালয়ের দিদিমণি একবার ক্লাসে বলেছিলেন, "সকলে মনে রাখবে, নারী মুক্তির ভিতই কিন্তু নারী শিক্ষা।"

প্রীতিষা মাইতি
পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

কুসংস্কারবিনাশিনী উমা

ঘুম থেকে উঠতেই তেরো বছর বয়সের ছোট্ট তিন্নি চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। তিন্নির মা রমা দেবী তড়িঘড়ি করে ঘরে এসে দেখলেন বিছানার চাদর লাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তিনি তিন্নিকে তাড়াতাড়ি করে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে দিলেন। তিন্নি তো তখনও কেঁদেই চলেছে। রমা দেবী তিন্নির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "কাঁদছ কেন সোনা?" তিন্নি তখন মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমার কি কোনো বড়ো রোগ হয়েছে মা ? ডাক্তার বাবু আমাকে কি অনেক ইনজেকশন দেবেন?" তিন্নির মা তার কপালে চুমু দিয়ে বললেন, "একদমই না সোনা। আজকে থেকে তুমি বড়ো হয়ে গেছো। এটাকে ঋতুস্রাব বলে। এটা তো সকল নারীর পরিচয়, এটাই তো মেয়েদের গর্ব।" তিন্নি তার মাকে বলল, "আজ যে অষ্টমী আমি কি মা দূর্গাকে অঞ্জলী দিতে যাবো না মা?" তিন্নির মা আলমারি থেকে একটা লাল পাড় সাদা শাড়ী এনে তিন্নির হাতে দিয়ে বললেন, "আজ তুমি মাকে অঞ্জলী দিতে অবশ্যই যাবে সোনা। অনেকেই বলে এই অবস্থায় নাকি ঠাকুরের পূজো করতে নেই অশুচি হয় কিন্তু তুমি যাবে কারণ তুমি তো আমার ছোট্ট জ্যান্ত দূর্গা। তুমি কি কখনও অশুচি হতে পারো বলো? মায়েরও তো এরকম হয় মাও তো মেয়ে তাহলে তখন তো সবাই মাকে পূজো করে আর এই অতিমারীর আবহে হয়তো আমরা প্রত্যেক বারের মতো আনন্দ করতে পারব না কিন্তু আমার সোনাকে আজ আমি নিজের হাতে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দেব। মা দূর্গা যেমন করে করোনা নামক ব্যাধিকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে চলেছে ঠিক তেমনি করে তুমিও সমাজের এই সকল কুসংস্কার ভেঙে সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি তো আমার ঘরের উমা।"

প্রীতি প্রামাণিক
ষষ্ঠ সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

“ছোটগল্প”

অতিমারীর আবহে মায়ের আবাহন

চোখ খুলতেই দেখতে পেলাম চারিদিকে অতল অন্ধকার। কেও কোথাও নেই। আমি শুধু একা। সেই অন্ধকার এ কিছু বুঝতে না পেরে, দিগ্বিদিক এর ঠাহর না করতে পেরে, সোজা হেঁটে চলেছি। "এ কোথায় এসে পড়লাম আমি? এত অন্ধকার, আলোর বিন্দু মাত্র নেই।"

হঠাৎ এক বিকট গন্ধে আমার গা টা গুলিয়ে উঠল। কোথাথেকে আসছে এ গন্ধ? তাও বুজলাম না। তখনই চোখে পরলো এক বীভৎস দৃশ্য। যা কখনো কল্পনাও কর নি যে দেখবো। দেখলাম কতগুলো পচা গলা ও খুবলানো দেহ পরে আছে। আর তার থেকেই বেড়াচ্ছে এই দুর্গন্ধ। আরেকটু পাশেই দেখলাম কতগুলো মানব দেহ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে।

এসব দেখে জ্ঞান হারাবার উপক্রম কিন্তু প্রশ্ন হলো যে কে করলো এসব? আরেকটু যেতেই দেখি কতগুলো ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ একটি ঘরের ভিতর লুকিয়ে আছে। তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে কী হয়েছে? তারা বলল," যে এক ভয়ানক অসুর আক্রমণ করেছে আমাদের পৃথিবীতে। " সে সবাইকে শেষ করে দিচ্ছে। আমি তো শুনেই অবাক। তারা বলল, "যে আমিও যেনো তাদের সঙ্গে এই ঘরে লুকিয়ে যাই। " তাদের সাথে কথা বলতে বলতেই শুনি হঠাৎ কান্নাকাটির মারণ চিৎকার। তাকিয়ে দেখি সেই সর্বকাল ও সর্ববিনাশী অসুর। যার দেহ বিশাল গোলাকার, তার দেহ থেকে বেড়াচ্ছে সবুজাভ আলোর ছটা। সে এক এক করে প্রত্যেক মানুষকে ধরছে ও তাদের প্রাণ পাখি শুষে নিচ্ছে এবং ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। কিছু মানুষতো তার ভয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। আমি এসব দখে এক দৌড়ে সেই ঘরে প্রবেশ করি এবং বাকি যে কজন মানুষ জীবিত ছিল তাদের সাথে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ আলোচলা করি। তখনই এক বয়স্ক ব্যাক্তি বলেন যে, এই বিপদ থেকে একজনই আমাদের বাঁচাতে পারবেন, সে হলেন এক

দেবী। যার আরাধনা করলে নাকি এই বিপদ থেকে মুক্তি মিলবে আমাদের। তখন সকলে মিলে আমরা সেই দেবীর আরাধনা শুরু করলাম। তেনাকে আমাদের বিপদে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাতে থাকলাম। অবশেষে অনেক প্রচেষ্টার পর দেবী প্রকট হলেন।

এই দেবীর দশ হাত। তার হাতে আছে-

১)মাস্ক

২) স্যানিটাইজার

৩) পি পি কিট

৪) গ্লাভস

৫)অক্সিজেন সিলিন্ডার

৬) গরম জলের ফ্লাক্স

৭) ওষুধ

৮) স্টেথোস্কোপ

৯) ফল ও সবজি

দশম এবং মহা অস্ত্র ১০) ভ্যাকসিন।

তিনি পৃথিবী তে আবির্ভূত হলেন এবং সেই অসুর এর সাথে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন। তার পরেই শুরু হল সেই গগন ভেদি ও বিশ্ব কাপানো যুদ্ধ। সারা বিশ্ব থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

ঠিক তখনই আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল আর ঠিক তখনই আমার কানে গেল সেই সুমধুর কণ্ঠ— "আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জির, ধরনীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, ..."

ঘড়িতে তখন ঠিক ৪ টে বাজে।

ভোর ৪টে, ৬ ই অক্টোবর, ২০২১। আর আমরা এখনও অতিমারির সঙ্গে যুদ্ধরত। এখন অপেক্ষা শুধু সেই দেবীর। তাকে মন থেকে আহ্বান জানাচ্ছি, "হে দেবী আবির্ভূত হও ও আমাদেরকে রক্ষা করো। তোমার হাতে নাই বা থাকলো মাস্ক বা স্যানিটাইজার, তোমার হাতে ত্রিশূলই যথেষ্ট"।

দীপাঞ্জনা দাস

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

মৃন্ময়ী

বেশ কয়েকদিন ধরেই অনাদি বেশ ব্যস্ত। কিছুটা নার্ভাস ও বলা যেতে পারে। সারাদিন খালি এদিক আর ওদিক করে বেড়াচ্ছে। গত একসপ্তাহ হল সে ছুটি নিয়ে বাড়িতে আছে, একমাসের ছুটি পেয়েছে সে তাই খুব ভাল করেই স্ত্রী পূজার খেয়াল রাখছে। সে যে প্রথমবার বাবা হতে চলেছে! এক আলাদা অনুভূতি! তাই ভীষণ দায়িত্ব তার। কোনো কিছুরই খামতি সে রাখছে না।

অনাদি, অনাদি সেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার; তার স্ত্রী পূজা, সে ঠিক গৃহবধু নয়। কারণ অনাদির আবার গৃহবধু পছন্দ নয়। পূজা একটা NGO চালায় সঙ্গে বিভিন্ন সমাজ সেবার সাথেও যুক্ত। গত চার বছর হল বিয়ে হয়েছে তাদের। অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ। কর্মসূত্রে অনাদি বেশিরভাগ সময়ই বাড়ির বাইরে থাকলেও ওদের দুজনের সম্পর্ক দেখে মনেই হয় না তা। উত্তর কলকাতার একটি বাড়িতে বাবা মা আর পূজাকে নিয়ে বেশ সুখের সংসার তার। প্রথমবার বাবা হওয়ার আনন্দে সে অনেক কষ্ট করে নিজের কাজ থেকে ছুটি পেয়েছে পূজার সাথে এই সময় কাটাবে বলে। তবে বেশিদিন যে সে ছুটি নিতে পারবে না সেটাও সে জানে। এই সময় যাতে পূজার কোনো চাওয়া যাতে অপূর্ণ না থাকে তাই সে সবসময়ই কিছু না কিছু আনতে থাকে। এতে অবশ্য পূজার ভীষন আপত্তি। কিন্তু কে শোনে কার কথা! চকলেট, চিপস, কেক, আইসক্রিম সবই ঘরে আগে থেকেই মজুত করে রেখেছে সে। তার উপর আবার সামনে পুজো; তাই বেশ অনেক বছর পর পুজোতে বাড়িতে থাকতে পেরে সে বেশ খুশি। তাই কেনাকাটা করতেও ছাড়েনি সে।

কাল যখন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল তখনই ডাক্তার জানিয়ে দেয় যে আজ বা কাল এর মধ্যেই ডেলিভারীর সম্ভাবনা আছে। কোনো সমস্যা হলেই যেন চলে আসে। তাই ক্লিনিক থেকে ফিরে আসার পরই অনাদি হাসপাতালে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে। হাতের সামনে সব জিনিস গুছিয়ে রাখছে। বলা যায় না,

কখন যেতে হতে পারে! পূজা এত কিছু দেখে নার্ভাস ঠিকই কিন্তু খুশিও বটে।

রাতের খাবার সবাই সেরে উঠেছে এমন সময় পূজা বলল "আদি (অনাদির পোশাকি নাম), আমার শরীরটা ভীষন খারাপ লাগছে!!" ব্যাস এইটুকুই.. সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ফোন করে পূজা কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে নিলো। রাতেই ভর্তি করা হল পূজা কে হাসপাতালে। আর যাওয়ার সময় বাড়িতে বলে গেল, "দেখ মা, জুনিয়র কে নিয়ে এবারের পুজোটা দারুন কাটবে আমাদের।" এই বলে তারা রওনা দিল। অনাদি একাই গিয়েছিল। বয়স্ক বাবা মা কে আর বেশি চিন্তায় ফেলতে চায়নি সে। তবে পূজার বাড়ি থেকে তার দিদি আর জামাইবাবু গিয়েছিল হাসপাতালে।

যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার অপারেশনের জন্য তৈরী করে পূজাকে। ভীষন ভয় পাচ্ছিল সে কিন্তু আদির হাসি মুখটা দেখে নিমেষেই যেন ভয় উড়ে যায় তার বরং আনন্দে দুচোখ ভরে ওঠে। মাতৃত্বের আনন্দে। ভোর হতেই নার্স এসে খবর দিলেন পূজা এক মিষ্টি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। মা এবং সন্তান দুজনেই ভালো আছে। আনন্দে যেন চোখে জল ধরেনা অনাদির। বাবা হয়েছে সে! মেয়ের বাবা!

কোনোমতে নিজেকে সামলে উদ্ধত হল সবাইকে এই খুশির খবর জানাবে বলে। কিন্তু হাসপাতালে কি আর নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়! তাই কিছুক্ষণের জন্য বাইরে এসেই ফোন করতে হল তাকে। অনাদি বাড়িতে খবরখানা জানিয়েই তার সেই বন্ধুদের খবরটা জানালো সে। তারা ও বেশ খুশি। খবরটা জানিয়ে সবেমাত্র কান থেকে ফোনটা নামিয়েছে এমন সময় হটাৎ এক আওয়াজে তার যেন হুশ ফিরল, দূর থেকে কানে ভেসে এল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র - র সেই আওয়াজটা, —

"যা চন্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মূলনী

যা ধূম্রেক্ষনচন্ডমূন্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।

শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা

সা দেবী নবকোটীমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশরী।"

হটাৎ তার মনে পড়ল 'আরেহ! আজ তো মহালয়া'। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখে ভোর চারটে বাজে তখন। নিজের অজান্তেই এক মিষ্টি ভাবনা বয়ে গেল তার মনের মধ্যে দিয়ে।

আপন মনেই বিড়বিড় করে বলে উঠল "মৃন্ময়ী"। না এটা এখন দুর্গা ঠাকুরের নাম নয় শুধু, তার মেয়েরও নাম। এতদিনের বাছাই করা লিস্টে লেখা সব নামগুলো যেন মূহুর্তে ফিকে হয় গেল তার কাছে। বরং লিষ্টে না লেখা নামটাই তার পছন্দ হল। কারন তার মেয়ে তো মা ই বটে। তার মা! আদরের মা! মহালয়াতে জন্ম তার, তাই সে "মৃন্ময়ী"।।

তিথি শীল

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বি.এস.সি. জেনারেল

রামনাথবাবুর আশ্চর্য দোকান

কালীনাথবাবু গরীব মানুষ। পোস্ট অফিসে সামান্য চাকরি করেন। তাই কাজের সূত্রে তাকে প্রায়ই এখানে সেখানে বদলি হয়ে যেতে হয়। আয়ের সাথে ব্যয়ের ভাবসাব নেই। কালীনাথবাবু ছিলেন মিনমিনে, তাই তাকে যখন তখন বদলি করে দেওয়া হয়। যদি রোখাচোখা মানুষ হতেন তাহলে কী তারা পারত এইভাবে বদলি করতে? এছাড়াও আজ এখানে কাল সেখানে বদলি করে তো ছেলেমেয়েও পড়াশোনার বারোটা বাজছে। তাই অফিসের বড়কর্তাকে বারবার করে দরখাস্ত করে অনুরোধ করায় তিনি বলেছেন, "আচ্ছা, এইবার তোমাকে শেষবারের মত নারায়ণপুরেই বদলি করা হচ্ছে।"

বাক্স - প্যাঁটরা গুছিয়ে সপরিবারে এক সন্ধ্যাবেলায় কালীনাথবাবু নারায়ণপুর স্টেশনে এসে পৌঁছলেন। বেশ ধকল গেল। ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা গোরুর গাড়িতে এসে তারপর আবার নদী পেরিয়ে আরও ক্রোশ দুই পথ পেরোলে তবে নারায়ণপুর। সেখানকার পোস্টমাস্টারকে আগে থেকে বলে কালীনাথবাবু একটি ঘর ভাড়া করে রেখেছিলেন। তাই রাতের বেলায় তাদের কোন অসুবিধা হয়নি। পাকা বাড়ি, টিনের চাল, কুয়ো আছে, উঠোন আছে।

জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। বাজার তাদের বাড়ি থেকে প্রায় দু-ক্রোশ দূরে। তাও আবার রোজ বসে না। সপ্তাহে দুদিন হাট। শনিবার আর মঙ্গলবার। গ্রামে সবার জন্য একটাই হাসপাতাল। আর বাচ্চাদের জন্য একটাই গ্রামে স্কুল আছে।সেখানেই নাকি গ্রামের সব ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেখে।

কালীনাথবাবুর এবং তার পরিবারের যে এই জায়গাটা খুব একটা ভালো লেগেছে তা না বললেই চলে। প্রথমদিন বাজার করতে দু'ক্রোশ পথ গিয়ে বেশ দমেই গেলেন তিনি। জিনিসপত্রের দাম খুব বেশি এবং সেগুলো খুব একটা ভালো না।পাওয়াও যায় না সবকিছু। এইসব দেখে গিন্নি রেগে গিয়ে বললেন, "দরখাস্ত করে অন্য জায়গায় বদলি করে নেও। এখানে মানুষ থাকে?"

একদিন সন্ধ্যাবেলায় কালীনাথবাবু খাটে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন আর এখন এই বাকি জীবনটা এখানে কীভাবে কাটাবেন এই ভাবছিলেন, আর ঠিক সেই সময় গিন্নি এসে বললেন, "ওগো সরষের তেল শেষ হয়ে গেছে। এক ফোঁটাও আর নেই শিশিতে। রাতে রান্না হবে কি করে? দেখোনা আশেপাশের বাড়িতে এইসব ছোটখাটো জিনিস পাওয়া যায় শুনেছি।"

এই কয়েকদিনে কালীনাথবাবুর খুব একটা কারোর সাথে পরিচয় হয়নি। তাই তিনি কার বাড়ি যাবেন, সেটাই বুঝতে পারছেন না। সে যাই হোক তিনি বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ডানদিকের পথ ধরে হাটতে আরম্ভ করলেন। কিছুদূর গিয়েই তিনি একটু দূরে ঝোপের মধ্যে দিয়ে একটা আলো জ্বলছে বলে মনে হল তার। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে হ্যাঁ তাই তো একটা ঝাপতোলা দোকানের আলো সেটা। কালো রোগা করে একজন লোক বসে আছে সেই দোকানে। সরষের তেলের খোঁজ করতেই লোকটি বলল, "আছে তো, ভালো ঘানির তেল।"

"দাম কত?"

লোকটি বলল, "ছ'টাকা।"

দাম শুনে কালীনাথবাবু একটু অবাকই হলেন। দু'ক্রোশ দূরের বাজারে সরষের তেল দশটাকা আর এখানে...। এই ভাবতে ভাবতে তিনি তাই আড়াইশো গ্রাম তেল কিনে আনলেন। গিন্নি তেল পরীক্ষা করে বলল, "বাহ! এতো খুব ভালো তেল এনেছ দেখছি। তা এত ভালো তেল কোথায় পেলে গো?"

কালীনাথবাবু বললেন, "এই কাছেই এক মুদির দোকানের সন্ধান পেয়েছি। বাজারের তুলনায় অনেক কম দাম।"

এরপর দুদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে মুসুর ডাল ফুরিয়ে যাওয়ায় সেই দোকানেই গেলেন কালীনাথবাবু। ডালের খোঁজ করতেই প্রায় অর্ধেক দামে তাকে পাঁচশো গ্রাম মুসুর ডাল দিয়ে দিলেন সেই ভদ্রলোকটি।

তখন কালীনাথবাবু ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, মশাই আপনার নাম কি?"

"আজ্ঞে, আমার নাম রামনাথ মজুমদার।"

"আপনি কি মোটামুটি সব জিনিসই রাখেন, রামনাথবাবু?"

"হ্যাঁ, আমার দোকানে সবই পাওয়া যায়। তবে আপনি সন্ধ্যার পরেই দোকানে আসবেন। দিনে আমি দোকান খুলি না কারণ ওই সময় আমাকে চাষবাস দেখতে হয়।"

তারপর খানিকক্ষণ রামনাথবাবুর সাথে সুখ-দুঃখের কথা বলে তিনি ফিরে এলেন। গিন্নি মুসুর ডাল দেখে খুব খুশি। বললেন, "ওগো,দোকানটা খোকাকে চিনিয়ে দিওতো! দরকার মতো ওকেও পাঠাতে পারব।"

তিনদিন পরে কালীনাথবাবু এক বাড়িতে নারায়ণ পূজোর নেমন্তন্ন খেয়ে রাতে বাড়ি ফেরার পর গিন্নি বললেন, "হ্যাঁগো তোমার রামনাথবাবুর দোকানটা ঠিক কোথায় গো? খোকাকে কুয়োর দড়ি আনতে পাঠিয়েছিলাম, তা সেতো দোকানটাই খুঁজে পেল নাতো। এমনকি আজ দাস বাড়ির গিন্নি গল্প করতে এসেছিল। কথায়-কথায় রামনাথবাবুর দোকানের কথা বললাম। কিন্তু সেতো প্রায় আকাশ থেকে পড়ল বলে মনে হল। "সাঁত জন্মে রামনাথবাবুর দোকানের কথা আমি শুনিনি।"

কালীনাথবাবু বললেন, "হয়তো নতুন খুলেছে দোকানটা। আমি খোঁজ নিয়ে এসে বলব খানে।"

পরদিন ময়দা আর ঘি কিনতে গিয়ে কালীনাথবাবু বললেন, "আপনার দোকানটা কতো দিনের পুরনো?"

রামনাথবাবু মাথা চুলকে বললেন, "তা প্রায় এই গ্রামের শুরু থেকেই আমার এই দোকান।"

কালীনাথবাবুর একটু খটকা লাগল। যদি দোকানটা এতোটাই পুরনো হয়, তাহলে দাস বাড়ির গিন্নি কেন এই দোকানের কথা শোনেননি?"

রামনাথবাবু যেন তার মনের কথা পড়ে নিয়েই বললেন, "এ গাঁয়ে আমার অনেক শত্রু। লোকের কথায় কান দেবেন না।"

"আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু কালকে আমার ছেলেও নাকি আপনার দোকান খুঁজে পায়নি।"

রামনাথবাবু বিনয়ের সাথে বললেন, "আর কাউকে পাঠানোর দরকার কি?

আপনি আসবেন।”

এর ঠিক কয়েক দিন পরে টর্চের ব্যাটারী আনতে গিয়ে কথা বলতে বলতে কালীনাথবাবু রামনাথবাবুকে বললেন, “আচ্ছা আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে তো আজ অবধি কোনদিনই দোকানে আসতে দেখিনি। তাহলে দোকানটা চলে কি করে?”

রামনাথবাবু একটু মুচকি হাসি হেসে বললেন, “একজনের জন্যই তো দোকান।”

“অ্যা!”

রামনাথবাবু বললেন, “আসবেন আবার।”

তা এভাবেই চলছে। চাল, ডাল, মশলাপাতি, ঘি, তেল সবই রামনাথবাবুর দোকান থেকে আনেন কালীনাথবাবু। বাচ্চাদের খেলনা, পোশাক, শাক-সবজিও ক্রমে ক্রমে আনতে লাগলেন। মাছ , মাংসও পাওয়া যেতে লাগল রামনাথবাবুর আশ্চর্য দোকান থেকে। গিন্নি খুশি, আর সাথেও কালীনাথবাবু কারণ তার মাইনের টাকা অর্ধেকের ওপর বেঁচে যাচ্ছে।

কালীনাথবাবু একদিন গিন্নিকে বললেন, “ওগো নারায়ণপুর থেকে বদলি হওয়ার দরখাস্তটা আর জমা দেওয়া হয়নি।”

“দিয়ো না। হ্যাঁ গো, রামনাথবাবুর দোকান টা ঠিক কোথায় বলতো? আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?”

কালীনাথবাবু বললেন, “না না,তোমাদের কারোরই ওখানে যাওয়ার দরকার নেই। সকলের কি সব সয়?”

গিন্নি চুপ করে গেলেন।

কালীনাথবাবু নারায়ণপুরেই রয়ে গেলেন।

মন্দিরা বসাক
তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

রমেশবাবুর রহস্যভেদ

[রমেশবাবু ও তার ছোট্ট মেয়ে তিন্নি হঠাৎই একটা চিঠি পান। চিঠিটি নিখিলবাবু মানে রমেশবাবুর ছোটোবেলার বন্ধু পাঠান তার কাকার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে এরপর রমেশবাবু ঠিক করেন তিনি যাবেন এবং সেই অনুযায়ী বেরিয়েও পড়েন, গ্রামের নাম পুতুলনগর। গ্রামটি ভারী সুন্দর, নিখিল জমিদারবাড়ির ছেলে তাদের বাড়িটি বাড়ি নয় রাজপ্রাসাদ। সেখানেই বেশ কিছুদিন খুব ভালো কাটছিল বিয়ের মধ্যে, তিন্নির খুব মজা হচ্ছিল কিন্তু এরই মধ্যে ঘটে গেলো এক দুর্ঘটনা।]

সকলের প্রিয় পিসিমা যিনি কিনা নিজের সত্তর বছর বয়সেও বিয়ের সমস্ত কাজ নিজের হাতে করেছেন সেই তিনি কিনা আজ মারা গিয়েছেন বাড়িতে তো কাঁদো কাঁদো রব কিন্তু সেই অবস্থাতেই মেয়েকে বিদায় দিতে হয়েছে এরপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা একে একে বাড়ি ফিরে যান এবার রমেশবাবুও বাড়ি ফেরার কথা ভাবেন এই সময় নিখিলবাবু তাকে আরো কিছু দিনের জন্য থাকার অনুরোধ করেন অগত্যা রমেশবাবুকে আরো কিছুদিন নিখিলবাবুর বাড়িতে থাকতে হয় এরইমধ্যে পিসীমার একমাত্র বিশ্বস্ত চাকর নিমাই তাকেও কেউ খুঁজে পায়না আবার এরইমধ্যে পিসিমাকে যে ডাক্তারবাবু দেখতে আসতেন তিনি নিখিল বাবুর বাড়ি এই খবর শুনে ছুটে আসেন এরইমধ্যে বলে রাখা ভালো রমেশ বাবু খুব ভালো করেই ডাক্তারবাবুর পোশাক-আশাক এবং চরিত্রটি খুব ভালো করে লক্ষ্য করেন ডাক্তারবাবুর পরনে প্যান্ট শার্ট মাথার চুলটা উস্কোখুস্কো যেন অনেকদিন যাবত নিজের খেয়ালটুকু রাখেননি জামা কাপড়টাও ময়লায় ভর্তি এবং হাতের ঘড়িটিও বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে কিন্তু পিসিমা যে মারা গেছে তার কোন দুঃখের ছাপ যেন ডাক্তারবাবুর মুখে কোথাও দেখলেন না রমেশবাবু ,মনে হবে যেন তিনি খুব উৎসাহ সহকারেই নিখিলবাবুর বাড়ি এসেছেন তা যাই হোক নিখিলবাবু বড় আপ্পায়ন সহকারে ডাক্তারবাবুকে নিজেদের সোফায় বসালেন এবং চায়ের জন্য অনুরোধ করলেন কিন্তু

ডাক্তারবাবু না করে দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন এসব কিভাবে হল ডাক্তারবাবু নিখিলদের খুব আপনজনই বটে তাদের বাড়ির কারোর কিছু হলে এই একমাত্র ডাক্তারবাবুই ভরসা তাই নিখিল বললেন, - "যে মৃত্যুর কারণ এখনো জানা যায়নি তবে পিসিমা সুস্থই ছিলেন তা আপনি ভালোমত জানেন হঠাৎই এমন এক ঘটনা ঘটলো।" তারপর এসব কথোপকথনের শেষে ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন কিন্তু তিনি রমেশ বাবুর সাথে কোন কথা বললেন না বা বলা যায় যে তিনি রমেশবাবু কে লক্ষ্য করেও লক্ষ্য করলেন না তা যাইহোক এরইমধ্যে আরও একটি ঘটনা ঘটে পিসীমার সাথে সবসময় গয়নার বাক্স থাকতো সেটি আজ হঠাৎ করেই নিখোঁজ সবাই ভাবলো। এ হয়তো নির্ঘাত নিমাই মানে পিসিমার বিশ্বস্ত চাকরের কাজ সে নিশ্চয়ই সেই গয়নার বাক্স চুরি করে পালিয়েছে কিন্তু রমেশবাবু তা মানতে চান না কারণ তিনি এই বাড়িতে আসার পর নিমাইয়ের চরিত্র দেখে বুঝতে পেরেছেন যে সে আর যাই হোক চোর নয়।

কিছুদিন পর অবশেষে পিসীমার ডেট সার্টিফিকেট আসে কিন্তু সেখানে এক অবাক কান্ড পিসিমার শরীরে বিষ ছিল এই কথা শুনে সবাই অবাক কিন্তু আবারও সবার সন্দেহ নিমাই এর উপরেই পরে ইতিমধ্যে বাড়িতে পুলিশের আনাগোনা শুরু হয় নিমাইকে পুলিশ হন্তদন্ত হয়ে খোঁজার চেষ্টা করে কিন্তু পুলিশ কোথাও তাকে খুঁজে পায় না এইসব ঝামেলার মধ্যে হঠাৎই নিখিলের শরীর খারাপ হয় এবং আবারও সেই ডাক্তারকে ডাকা হয় এবারে ডাক্তার আসেন নিখিলকে দেখেন এবং হঠাৎই তার সাথে রমেশবাবুর চোখাচোখি হয় সেই সময় রমেশবাবু ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করেন,"এখন নিখিল কেমন আছে?" উত্তরে একটু মুচকি হেসে ডাক্তার জানায়, - "যে নিখিল এই ঝুট-ঝামেলার মধ্যে নিজের একদম খেয়াল রাখতে পারছেন না তাই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তাকে বিছানা-সজ্জা থাকতে বলে যান এবং তার সাথে আরও একটি কথা বলেন যে "এইসব পুলিশ কাছারি না করে সে যেন নিজের শরীরের প্রতি খেয়াল রাখে যে গেছে সে গেছে তার জন্য আবার পুলিশের দরকার কিসের।"এই কথা শোনার পর রমেশবাবুর খটকা

হলো কিন্তু তিনিও হাসতে হাসতে পাল্টা জবাব দিলেন - "আসলে পিসিমাতো শরীরে বিষ পাওয়া গেছে বলে একটু দুশ্চিন্তায় আছে নিখিল।"এরপর ডাক্তার চলে যায় কিন্তু তার মুখে প্রথমদিনে যে খুশি ছিল সেটা হয়তো পুলিশের খবরে ভয়ে পরিণত হয়েছে এটা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করলেন রমেশবাবু কিন্তু তার মনে একটা প্রশ্ন জাগে "কিন্তু সেটা কেন?" কেন ডাক্তারবাবুর মুখে ভয়ের ছাপ দেখলেন তিনি? এরপরদিন যায় কিন্তু নিখিলবাবু সুস্থ হয় না আরো যেন অসুস্থ হয়ে পড়েন আবারো ডাক্তারকে ডাকা হয় কিন্তু এবার ডাক্তারবাবুও নিখোঁজ হয়ে যান কি আশ্চর্যের ব্যাপার পিসিমার যাওয়ার পর প্রথমে নিমাই তারপর ডাক্তারবাবু দুজনেই নিখোঁজ? পিসীমার মৃত্যু যেন কেমন রহস্যে ভরে উঠলো রমেশবাবুর কাছে তাই তিনি ঠিক করলেন তিনি আরো কিছুদিন নিখিলবাবুর বাড়ি থাকবেন। এদিকে সবাই চিন্তিত নিখিলবাবু সুস্থ না হলে কারবার সামলাবে কে এদিকে কারবারে যে অনেক চুরি হচ্ছে। না আর রমেশবাবু থাকতে পারলেন না তিনি এবার ঠিক করলেন ডাক্তারবাবুর বাড়ি যাবেন সেই অনুযায়ী তিনি একাই ডাক্তারবাবুর বাড়ি গেলেন ওখানে গিয়ে তিনি আশ্চর্য হলেন ঘরে তালা দেওয়া এবং আশেপাশে কাউকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন প্রায় কিছুদিন যাবত ডাক্তারবাবুর হাবভাব কেমন যেন একটা হয়ে যাচ্ছিল এবং কেউ জানেনা যে তিনি কোথায় গেছেন এবং কবে গেছেন। এরপর রমেশবাবু ফিরে আসেন এদিকে নিখিলের অবস্থা খারাপ হতে থাকে ঠিক করা হয় শহর থেকে ডাক্তার আনা হবে এবং সে অনুযায়ী আনাও হলো ডাক্তার এসে এক আশ্চর্যজনক কথা বললেন নিখিলের শরীরে নাকি একটু একটু করে বিষ প্রবেশ করছে এই কথা শুনে সবার মাথায় হাত পড়ে তাহলে এখন কি করা যায় শহরের ডাক্তার সেই বিষ বের করতে নানা ওষুধের সাহায্য নেন এবং শেষপর্যন্ত বিষ শরীর থেকে বেরিয়ে যায় কিন্তু নিখিলবাবু খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন তাই তাকে কিছুদিনের জন্য বিছানা সজ্জা থাকতে হয়। রমেশবাবুর এবার সন্দেহটা আরও গারো হল তাই তিনি পুলিশ ইন্সপেক্টর কে গ্রামের ডাক্তারের বাড়ি হানা দিতে বললেন পুলিশ সেই অনুযায়ী ডাক্তারের বাড়ি হাজির হয় তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে এবং ঢুকে দেখে সেখানে একটি ছোট সিন্দুক আর জামাকাপড় এদিক ওদিক, বিছানা বিছানো এবং তারি মাঝে একটি বড় প্লাস্টিকের ব্যাগ।পুলিশের সাথে রমেশবাবু ছিলেন ঘরের চারদিক

দেখতে দেখতে হঠাৎই তার লক্ষ্য পরে বড় প্লাস্টিকটা যেন নড়ছে পুলিশ তখন তৎক্ষণাৎ প্লাস্টিকের ব্যাগটা খলে এবং দেখে সেখানে নিমাইকে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে তার মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা হাত পা মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাঁর হাত-পা-মুখ খোলে। নিমাই হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁদতে কাঁদতে জল চায়, সে জল খেয়ে বলে - "ওই ডাক্তার আমার পিসিমাকে মেরেছে তাকে রোজ একটু করে বিষ দিত। আমি জেনে গিয়েছিলাম বলে ও আমাকে বেঁধে রাখে, ওর আমার পিসীমার গয়নার বাক্সের প্রতি প্রথম দিন থেকেই লোভ ছিল বিয়ের রাতে সে জানতো পিসিমা মারা যাবে ডাক্তার সেরকমভাবেই বিষ এর ডোজ ঠিক করেছিল। পিসিমা যখন শেষ ওষুধটা খেয়ে হাপাচ্ছিল আমি তখন সবাইকে ডাকবো বলে নিচে ছুটে গেছিলাম তখনই ওই ডাক্তারের আসল রূপ দেখতে পাই ও আমাকে মেরে এই ঘরে আটকে রাখে আর পিসিমার গয়নার বাক্স নিয়ে পালিয়ে যায়।"এই বলতে বলতে বেচারা নিমাই কেদে ফেলে এরপর আরো বলে যে- "সে আমার নিখিল দাদাবাবুকেও মেরে ফেলবে বলে ঠিক করেছিল কারণ তার দ্বিতীয় নজর ছিল নিখিল দাদাবাবুর কারবারের ওপর।"সব শোনার পর পুলিশ তৎক্ষণাৎ চারিদিকে খবর দেয় এবং দুদিন পর ডাক্তারবাবুকে খুঁজে পাওয়া যায় সে সবকিছু নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাবে বলে ঠিক করে তাই গ্রাম ছেড়ে শহরে যায় এবং তারপর ট্রেন ধরবে বলে ব্যারাকপুর স্টেশন যায় সেখানেই পুলিশ তাকে ধরে,সে এখন জেলে।

এরপর পিসিমার কাজ শেষ হলে রমেশবাবু ও তার মেয়ে চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হন নিখিলবাবু তাদের বিদায়ের সময় রমেশবাবুকে গলা জড়িয়ে বলেন - "তুমিই সত্যিই আমার বন্ধুত্ব রেখেছো।"এরপর রমেশবাবু ও তার মেয়ে ট্রেনে চেপে সবাইকে বিদায় জানায়।

সমাপ্ত

সায়ন্তিকা দাস

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

মহিষাসুরমর্দিনী

সবে স্কুলের অনলাইন ক্লাস করে উঠল পাঁচ বছরের টুকটুকি। সেই গতবছর থেকে বাড়িতে বন্দি হয়ে আছে বেচারি। স্কুলে যেতে হচ্ছে না, বন্ধুদের সঙ্গে দেখাও হচ্ছে না, খেলতেও যাওয়া নেই। তাদের পাড়ায় প্রতিবার দূর্গা পূজো হয়, কিন্তু এই করোনা পরিস্থিতির কারণে আগেরবারও পূজো হয়নি আর এইবারেও হবে না। তাই তার মনটা একটু খারাপ।তবে সে ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে। জানে,যে একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এখন গোটা পৃথিবী। বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না বলে মনে একটু কষ্ট হলেও তাও বায়না করে না একটুও।বিকেল বেলায় সময় কাটানোর জন্যে সে প্রতিদিন ঠাম্মির কাছে গল্প শোনে। ঠাম্মি প্রতিদিন তার ঝুলি থেকে নতুন নতুন রাজা-রানী, রাক্ষস-খোক্ষস, ভূত-পেত্নি, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে গল্প বলে।

আজ মহালয়া, তাই ঠাম্মি টুকটুকিকে মা দূর্গার মহিষাসুর বধের কথা বলা আরম্ভ করল।ঠাম্মি বলল, "দিদিভাই তুমি মহিষাসুরের কথা শুনেছ তো? জানতো ও কত বড় অসুর ছিল। আর মা দূর্গা সেই মহিষাসুরকে বধ করে দেবকুলকে তার হাত থেকে রক্ষা করেছিল।"

টুকটুকি বলল, "কি করে গো ঠাম্মি? "

"প্রাচীনকালে অসুর আর দেবতাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লেগেই থাকত। একদিন মহিষাসুর দেবলোক আক্রমণ করল। অসুরদের রাজা মহিষাসুর আর দেবতাদের রাজা দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। দেবতাদের বল কম ছিল না কিছুই কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার থেকে প্রাপ্ত বরের কারণে মহিষাসুরকে কোন দেবতা, অসুর কেউ মারতে পারবে না। ব্রহ্মার এই বরের ফলেই মহিষাসুর আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।তার অত্যাচারের ফলে দেবলোক থেকে শুরু করে পাতাললোকরাও পর্যন্ত অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল।তারপর সেই যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হয়ে ত্রিদেবের কাছে পালিয়ে গেল আর অসুররা স্বর্গ-রাজ্য দখল করল।"

আর টুকটুকি এদিকে হা করে ঠাম্মির গল্প শুনতে ব্যস্ত।

"এদিকে মাতা লক্ষী নারায়ণকে তার দুশ্চিন্তার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আজ দেবতাদের কাছে শুধু একটা মাত্রই চিন্তা দেবী আর সেটা হলো মহিষাসুর, ও ইন্দ্রলোকেও নিজের আধিপত্য স্থাপন করে ফেলেছে।" মহিষাসুরকে কীভাবে পরাজিত করা যায় এই নিয়ে ত্রিদেব থেকে শুরু করে সকল দেবতারা যখন ভাবছেন যখন নারদ এসে বলল, "নারায়ণ নারায়ণ, মহিষাসুর অত্যন্ত শক্তিশালী এটা সত্যি, কিন্তু ত্রিদেবের শক্তি একত্রিত হয়ে কি তার মোকাবিলা করতে পারে না? ব্রহ্মাদেব সৃষ্টি করেন, নারায়ণদেব পালন করেন আর মহাদেব ধ্বংস করে থাকেন। তাহলে আপনাদের তিনজনের শক্তি একত্রিত করে নারায়ণ নারায়ণ... ।"

"তারপর ত্রিদেব নিজেদের শক্তি একত্রিত করে মা দূর্গাকে সৃষ্টি করলেন। এরপর মা দূর্গাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য তাকে সুসজ্জিত করতে থাকেন। মা দূর্গা দশহাতে দশরকমের অস্ত্র নিয়ে তার বাহন সিংহের পিঠে করে গেলেন মহিষাসুরবধ করতে। মা দূর্গা আর অসুরদের সাথে প্রবল যুদ্ধ হয়ে। প্রথমে মহিষাসুর দেবীকে মেয়ে বলে অনেক অপমান করেন। দেবী দুর্গা আর মহিষাসুরের মধ্যে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হওয়ার পরে শেষপর্যন্ত মা দূর্গা মহিষাসুরকে বধ করে পুরো বিশ্বসংসারকে রক্ষা করেন। আর তারপরেই মা দূর্গাকে মহিষাসুরমর্দিণী রূপে মর্তলোকে পূজো করা হয়।"

"কেমন লাগল গল্পটা দিদিভাই?" খুব ভালো লেগেছেগো ঠাম্মি।" টুকটুকি আনন্দে নাচতে নাচতে বলল।

"দেবতাদের মতো আমরাও এই দুঃসময় ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারব। তখন আবার তোমরা স্কুলে যাবে, খেলতে যাবে, আবার পাড়ায় পূজো হবে! তাই মন খারাপ করবে না একদম, কেমন?"

মন্দিরা বসাক

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

“ খোলা চিঠি ”

শ্রীচরণেষু মা,

তুমি কেমন আছো? ভালো আছো তো। প্রথমেই তোমাকে শরৎ-এর এই সুরভিত লগ্নে শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালবাসা আর প্রণাম জানাই। আমার সব রাগ, অভিমান, অভিযোগ, আবদার সবই তোমাকে ঘিরে। আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ডাক হল মা।এই উনিশ বছরে এইটুকু ভাল করে বুঝেছি যে, মা তুমি কোন রকম স্বার্থ ছাড়াই এতকাল আমার কথা ভেবে এসেছ। এছাড়া যতই কাছের সম্পর্ক হোক না কেন তার মধ্যে বেশিরভাগই দেনা-পাওনার সম্পর্ক। তাই বলে আমি কোন সম্পর্ককেই ছোট করছি না।কারণ তারাও তো আমাকে হাত ধরে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।মা তোমার মনে পড়ে, তখন আমি নবম শ্রেণিতে পড়ি। সেইবার আমার আর বোনের যখন ডেঙ্গু হল, তখন তুমি দিনরাত এক করে আমাদের সেবা করেছ। এছাড়াও ছোটবেলা থেকে আরও অনেক কিছু করেছ তুমি।আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছ মা। তুমি তো আমার কাছ থেকে কোনদিন কোন কিছুই চাওনি।তোমার চাহিদা খুব কম মা।তাও আমি জানি, তুমি চাও আমি যেন তোমার হাতটা এইভাবে সারাজীবন শক্ত করে ধরে রাখি,যেমন এখন আছি।

এই পৃথিবীর লোকেরা খুব খারাপ।যখন আমার খুব মন খারাপ করে,ভয় করে তখন মনে হয় যেন ছোটবেলার মত তোমার আঁচলের নিচে গিয়ে লুকিয়ে পড়ি। তাহলে আমাকে আর কেউ কোনদিনই খুঁজে পাবে না। আমার একটা ছোট ইচ্ছা আছে মা, আমি বড়ো হয়ে চাকরি করে অর্থ উপার্জন করে তোমার আর বাবার জন্য একটি পাকাবাড়ি বানিয়ে দেব।

আমি জানি তুমি যখন এই খোলা চিঠিটা পড়বে তখন তুমি বলবে,

"আমার সোনাই কত বড়ো হয়ে গেছে।" দূর্গা পূজো প্রায় এসেই গেল মা। প্রতিবারের মতো এবারও তোমার হাত ধরে, হাতে বেলুন নিয়ে মন্ডপে মন্ডপে ঠাকুর দেখতে যাব। তুমি ভালো থেকো, সাবধানে থেকো আর নিজের শরীরের যত্ন নিও।

ইতি,

তোমার পাগলি মেয়ে

সোনাই

মন্দিরা বসাক

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

শ্রী চরণেশু শ্রী বিদ্যাসাগর মহাশয়,

আমার সহস্র প্রণাম নেবেন হে মহামানব। আজ বাধ্য হয়ে একটি চিঠি আপনাকে দিতেই হচ্ছে। আজ যে আমরা এছাড়া আর কিছুই করতে পারছিনা! আপনি সেই যে গেলেন তারপর দিয়ে এই সমাজে মেয়েরা আদেও স্বাধীন ও সুরক্ষিত হয়েছে? আজ একবিংশ শতাব্দীতেও মেয়েরা হিংস্র পশুরুপ মানুষগুলোর কবলে কোনো না কোনো সময় লাঞ্ছিত - নিপীড়িত - শোষিত! শহর ও গ্রামের অলিতেগলিতে প্রায়েই পড়ে থাকে অসহায় মেয়েগুলোর নিথর দেহ। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা পড়তে পারলেও, চাকরিতে সম - অধিকার লাভ করলেও দিনের শেষে কিন্তু রাস্তায় বেরোলে আজও মেয়েরা ভয় পায়! অন্ধকার রাস্তাগুলোকে এড়িয়ে চলে, রাস্তায় - বাসে-ট্রেনে হঠাৎ যদি কোনো অচেনা লোকের সাথে ধাক্কা লাগে বুকটা কেঁপে ওঠে। বাড়িতে কেউ না থাকলে মেয়েদের দরজাটুকু খুলে দেখতে ভয় হয়। সংসারের জাতাকলেও পিষতে হয় মেয়েদের প্রতিনিয়ত। রান্নায় ঝাল বেশি বা নুন কম হলে, শীতকালে গরম জল না করে দিলে, গরমকালে ঠান্ডা পানীয় আর বরফের টুকরো সংরক্ষিত না রাখলে, সকালের চা আর খাবারটা মুখের সামনে এনে না দিলে, স্বামীর থেকে বেশি শিক্ষিত হলে অথবা স্বামীর থেকে একটু ভালো চাকরি করলে আজও মেয়েদের সমাজের নানান কথা শুনতে হয়। বিয়ের পর স্বামীর অত্যাচার আজও প্রচলিত। আর আঁপনি সেই যে 'বিধবা বিবাহ' নামক মহান কর্মটি করে গেছিলেন এই সমাজের দিকে তাকালে তারও বিশেষ কিছু ফল আর হচ্ছেনা মনে হয়। সবাই ভুলে না গেলেও সম্মান দেয়না সেই নিয়মকে। বিধবার পর বিবাহ হলেও জীবনের কোনো না কোনো মুহূর্তে তাকে শুনতেই হয় "আগের জন্মে পাপ করেছিল, ফল পাচ্ছে। আবার কি!"... আর বিবাহ না করলেও পিষে থাকতে হয় সমাজের সমালোচনার মাঝে।

এদিকে আবার মেয়েরা যদি চব্বিশ বছরের মধ্যে চাকরি না খুঁজতে পারে

বাবাদের মাথায় পড়ে হাত। আর রোজ রোজ শুনতে হয় সেই মেয়েকে "বাবার দুর্ভাগ্য তুই!" তাই আজও সমাজে ছেলেদের মূল্যই বেশি। ছেলে চাই ছেলে চাই করে সমাজ পাগলে পরিণত হচ্ছে।

আবার বৃদ্ধ বয়সেও পুরুষরা তাদের মা কে দোষারোপ করতে ছাড়েনা। সেই মা কে বোঝা মনে হয় সেই উচ্চশিক্ষিত পুরুষদের। তাই ছেড়ে আসে কোনো এক বৃদ্ধাশ্রমে।

এইভাবে জীবনের প্রতিটা স্তরে সমাজের কিছু কিছু নিকৃষ্ট মানসিকতার পুরুষরা নিজেদের অধিকার আরোপ করে চলেছে নারীজাতির ওপর।

কই আপনি ? আসুন একটিবার এই কলুষিত মর্ত্যে। শ্রী কৃষ্ণের মতো যুগে যুগে ছদ্মবেশ ধারণ করে আসুন। মুক্তি দিন আমাদের। নারীজাতিকে রক্ষা করুন। বাঁচান এই সমাজকে। নয়তো কোনো একদিন মেয়েরা লুপ্ত হয়ে যাবে আর পথে পথে কুকুরের দল ছিঁড়ে খাবে ওই হিংস্র পুরুষরূপ পশুগুলোর দেহ।

ইতি,

অভাগী নারী জাতি

প্রীতিষা মাইতি

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

“ আঁকি বুঁকি ”

বৈশাখী গাইন
তৃতীয় সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

রূপসা চ্যাটার্জী
তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বি.এ.জেনারেল

ইন্সিকা ঘোষ
তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

“ ফ টো গ্রা ফি ”

“ Real eyes realize real lies ”

দেবিকা সাহা,
ষষ্ঠ সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ),
বি. এ.জেনারেল

প্রীতিষা মাইতি
পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

শিল্পী মানেই তুলির টান , শিল্পী মানে নিস্প্রনে প্রাণদান

সুলগ্না দে
তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

আশ্বিনের শারদ প্রাতে

তৃষা চক্রবর্তী
ষষ্ঠ সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)
বাংলা বিভাগ

ঈশা মন্ডল

তৃতীয় সেমিস্টার (দ্বিতীয় বর্ষ)

ভূগোল বিভাগ

সায়ন্তিকা দাস

পঞ্চম সেমিস্টার (তৃতীয় বর্ষ)

বাংলা বিভাগ

“ସମାପ୍ତ”